বিদেশী কূটনীতিক স্বদেশী রাজনীতিক

কাঠগড়ায় বাংলাদেশ

হাসান মূর্তাজা

অপহৃত সীতা বন্দি লংকা দ্বীপে। রাবণ তাকে অপহরণ করেছে। সীতা উদ্ধারে এসেছে রাম। কিন্তু সমুদ্র ডিঙিয়ে দুর্ভেদ্য দুর্গ ভেদ করে সীতাকে উদ্ধার করা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। বুদ্ধিমান রাম পাশে টানলেন রাবণের বৈরী ভাই বিভীষণকে। বিভীষণই দেখিয়ে দিলো সীতাকে উদ্ধারের রাস্তা। রাম-রাবণের ভয়াবহ যুদ্ধে রাবণ হলো পরাজিত। রামায়ণ পাঠে আমরা চিনলাম 'ঘরশত্রু' বিভীষণকে। যে নিজের প্রতিহিংসা মেটাতে শত্রুকে অন্দরমহলের পথ চিনিয়ে দেয়।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো যেন একেকটি 'ঘরশত্রু বিভীষণ'। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য তারা প্রতিনিয়ত 'নেমন্তন্ন' করছে বিদেশী 'শত্রুদের'। এসব বিদেশীর কারণে এককালে যে সোনার লংকা জ্বলে ছারখার হয়েছে সে কথা বেখবর আমাদের 'বিভীষণেরা'। তাদের লক্ষ্য একটাই। প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলকে যেন-তেনভাবে ল্যাং মেরে ক্ষমতার কুরসি দখল। ক্ষমতার মসনদের নরম গদির লোভে তারা এতটাই মত্ত, অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপের ভয়াবহতা তাদের চিন্তায় নেই। দেশের ভবিষ্যৎ, কোটি জনতার স্বার্থ যে এতে জলাঞ্জলি যায়, সেই ভাবনার সময় তাদের কোথায়? 'খাল কেটে কুমির' আনার মতো দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক দল অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ডেকে আনছে বিদেশীদের। তাদের 'সার্টিফিকেট'কেই ক্ষমতা জেতার মোক্ষ হিসেবে গ্রহণ করছে। বিদেশী মহলবিশেষের বাণীই যেন বাংলাদেশের রাজনীতির শেষ কথা। আমাদের রাজনীতিকরা ভুলেই গেছেন, দেশের জনগণই ক্ষমতার প্রধান উৎস।

এ দেশের রাজনীতিতে বিদেশী হস্তক্ষেপ নতুন নয়। জন্মাবধি তা হয়ে আসছে। উন্নয়নের জন্য ঋণের ওপর নির্ভরশীল দরিদ্র দেশগুলোতে দাতাদের খবরদারি সর্বজনস্বীকৃত। দাতারা নিজ দেশের করদাতাদের টাকা আমাদের দেয়। কাজেই সেই টাকার হিসাব নিতে তারা নাক গলাবে, শর্ত দেবে এটাই স্বাভাবিক। এই 'নাক গলানো' গৃহীত ঋণের বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকবে সেটাই কাঙ্ক্ষিত। আশঙ্কার কথা, বাংলাদেশে দাতা দেশ এবং বিদেশী মহলের খবরদারি বাড়াবাড়ি পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। বাংলাদেশে আগামী নির্বাচন হবে কি হবে না, ক্ষমতায় আসতে পারে কোন 'শক্তি'- এ ধরনের একান্ত অভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ে বিদেশীরা এখন মন্তব্য করছে। বিদেশীদের এ ধরনের কথা বলার সাহস ও ক্ষেত্র দুটোই তৈরি করে দিয়েছেন আমাদের রাজনীতিবিদরা।

তিনটি প্রসঙ্গ বর্তমানে প্রবল বিতর্ক জমিয়েছে। প্রথমত, ঢাকায় বসে বিদায়ী মার্কিন রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টমাস জুনিয়রের মন্তব্য। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ ঘুরে গিয়ে দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্রিস্টিনা রোকার সংসদীয় কমিটিতে রিপোর্ট। তৃতীয়ত, লন্ডনে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে আয়োজিত 'বাংলাদেশ কনফারেন্স-২০০৫'।

১৪ জুন ঢাকায় বাংলাদেশ কূটনৈতিক সাংবাদিক সমিতি (ডিকাব) আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশে নিযুক্ত বিদায়ী মার্কিন রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টমাস এ দেশের রাজনীতি নিয়ে বেশ খোলামেলা মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, 'এ দেশে অনেক রাজনৈতিক শক্তি রয়েছে। অতীতে অন্যান্য শক্তির ক্ষমতা দখল করার উদাহরণ সবার জানা... রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যকার বিরাজমান সম্পর্ক এ দেশের গণতন্ত্রের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। জাতীয় সমস্যাগুলো মোকাবেলায় বড় দলগুলোকে বসে একযোগে কাজ করতে হবে। এতে ব্যর্থ হলে জনগণ বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজে নিতে বাধ্য হবে, যা কারো জন্যই ভালো হবে না' (সমকাল, ২১ জুন ২০০৫)। হ্যারি কে টমাস ঝেড়ে কাশেননি। বলেননি বিকল্প ব্যবস্থাটি আসলে কী। ইঙ্গিত দিয়েছেন মাত্র। বোঝা যায়, এই বিকল্প ব্যবস্থাটি দেশের প্রচলিত রাজনৈতিক দলগুলোর বাইরে ভিন্ন কোনো শক্তি। তা সামরিক হতে পারে কিংবা সশস্ত্র জঙ্গিবাদী

স্থান-কাল-পাত্র যদি বদলে যেত, এতো খোশমেজাজে হ্যারি কে টমাস দেশে ফিরে যেতে পারতেন না। পারলেন, কারণ দেশটির নাম বাংলাদেশ। সবাই জানে দেশে দেশে খোদ যুক্তরাষ্ট্র এমন 'বিকল্প ব্যবস্থা'কে সমর্থন যুগিয়ে এসেছে

কোনো মহল। কোনো দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এমন ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য কখনোই কূটনৈতিক শিষ্টাচারের মধ্যে পড়ে না। স্থান-কাল-পাত্র যদি বদলে যেত, এতো খোশমেজাজে হ্যারি কে টমাস দেশে ফিরে যেতে পারতেন না। পারলেন, কারণ দেশটির নাম বাংলাদেশ। সবাই জানে দেশে দেশে খোদ যুক্তরাষ্ট্র এমন 'বিকল্প ব্যবস্থা'কে সমর্থন যুগিয়ে এসেছে। পাকিস্তান, আফগানিস্তান কিংবা আলজেরিয়া এর উদাহরণ। অথচ আমাদের কোনো রাজনৈতিক দলই হ্যারি কে টমাসের কাছে বক্তব্যের ব্যাখ্যা দাবি করেনি। বরং সরকারি দল বলেছে, এটা 'বন্ধুত্বপূর্ণ মন্তব্য'। বিরোধী দল মনে করছে, এতে সরকারের ওপর যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি হয়নি। এবং 'এ বিতর্কে আমাদের কোনো লাভ নেই' (সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, সমকাল, ২১ জুন ২০০৫), অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থাও তথৈবচ। আত্মমর্যাদা এবং দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা কতখানি কমে গেলে রাজনৈতিক দলগুলো বিদেশী কূটনীতিকের এমন কুটিল মন্তব্যের পরও আত্মতুষ্টিতে ভুগতে পারে!

বাংলাদেশ ঘুরে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সংসদের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগর বিষয়ক উপ-কমিটিতে সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্রিস্টিনা রোকা একটি রিপোর্ট পেশ করেন ১৪ জুন। প্রেসিডেন্ট বুশ দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর দক্ষিণ এশিয়ার মার্কিন নীতি-নির্ধারণীতে এটাই প্রথম রিপোর্ট। ক্রিস্টিনা রোকা দক্ষিণ এশিয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী। তিনি এর আগেও বাংলাদেশ সফর করেছেন। এবার তিনি যে রিপোর্ট তুলে ধরেছেন তাতে বলা হয়েছে, 'রাজনৈতিক শত্রুতা, সুশাসনে ব্যর্থতা, ব্যাপক দুর্নীতি ও ক্রমবর্ধমান জঙ্গি তৎপরতা এ দেশের গণতন্ত্রের স্থিতিশীলতাকে বিপন্ন করছে। ... উগ্রবাদী গ্রুপগুলো আরো বেশি খোলাখুলিভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।' রোকার মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ। এ অঞ্চলে মার্কিন নীতি নির্ধারণে তার ভূমিকা ব্যাপক। রোকা রাজনৈতিক কোন্দল, দুর্নীতি, উগ্রবাদ নিয়ে কথা বলেছেন। সমস্যাগুলো একান্তই বাংলাদেশের। অথচ উদ্বিগ্ন যুক্তরাষ্ট্র। এ উদ্বেগ আসলে নাক গলানোর ছুতো। এ ছুতো তৈরি করে দিয়েছেন আমাদের রাজনীতিবিদরা। তারা মনে করেন, বিদেশী রাষ্ট্রদূত এবং মিশনগুলো বাংলাদেশে 'পঞ্চায়েত' খুলে বসে আছে। অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো নিয়ে তারা সেই পঞ্চায়েতে সালিস মানতে যায়। বিদেশী কূটনীতিকের বক্তব্যকে বেদবাক্য মেনে শুরু করে নতুন রাজনৈতিক খেলা। আমাদের দরজার বাইরে বসে লেজ নাড়তে থাকা বিদেশী মহলগুলো দেখেছে এই তো মওকা। দিনে দিনে তাদের স্পর্ধা বেড়েছে।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ইস্যুতে বক্তব্য দেয়া বিদেশী কূটনীতিকদের কালচারে পরিণত হয়েছে। দোষ একতরফাভাবে বিদেশীদের নয়। আমাদের। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর বালসুলভ রাজনীতির। রাজনৈতিক দলগুলোর বালখিল্যতার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হতে পারে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল নামে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার দুর্নীতিবিষয়ক বার্ষিক প্রতিবেদন এবং এর প্রতিক্রিয়া। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় বাংলাদেশকে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন খেতাব দেয়া হলে তৎকালীন বিরোধীদল বিএনপির মুখে হাসি একান-ওকান বিস্তৃত হয়। দেশ দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন। এতে খুশি হবার কী আছে? আছে, কারণ এই সার্টিফিকেটকে ময়দানি বক্তৃতায় ব্যবহার করা যায়। প্রতিপক্ষকে দুর্বল করা যায়। ক্ষমতায় আসার পথ পরিষ্কার হয়।

বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশ দুর্নীতিতে হ্যাটট্রিক করে বসল। দেখা গেল, দন্ত বিকশিত আকর্ণ হাসি এখনো আছে। এবার তা বিরোধীদল আওয়ামী লীগের মুখে। যারা নিজেদের সময় দুর্নীতির এই মাপকাঠিকে প্রত্যাখ্যান করেছিল জোরালোভাবে। সংস্থা হিসেবে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল নিজেই প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়। সংস্থাটির আয়ের উৎস রহস্যময়। অথচ প্রতিবারই বাংলাদেশের কোনো না কোনো বৃহৎ রাজনৈতিক দল সংস্থাটির বিতর্কিত জরিপকে স্বীকৃতি দিয়েছে। প্রতিষ্ঠা পেয়েছে বিদেশীদের দাবি। বাংলাদেশে দুর্নীতি আছে এ কথা সত্য। তাই বলে বিশ্বে আমরা এক নম্বর দুর্নীতিবাজ এমন কোনো অকাট্য প্রমাণ কারো হাতে নেই। বিদেশী সংস্থার প্রশ্নবিদ্ধ জরিপকে সাদরে গ্রহণ করে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোই আসলে বাংলাদেশকে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন বানিয়েছে।

বাঙালি আত্মঘাতী, বলেছিলেন নীরদ চন্দ্র চৌধুরী। এ কথা আরো একবার প্রমাণিত হলো লন্ডনের 'বাংলাদেশ কনফারেন্স ২০০৫'-এর মাধ্যমে। যুক্তরাজ্যের সংসদীয় মানবাধিকার গোষ্ঠী এবং 'বাংলাদেশ কনফারেন্স স্টিয়ারিং কমিটি' নামে একটি সংগঠন বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ লর্ডসভার সদস্য এরিক এভেবারি। আয়োজক 'স্টিয়ারিং কমিটি' গঠিত হয়েছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, আওয়ামী লীগ, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি এবং সরকারবিরোধী কয়েকটি সংগঠনের সহায়তায়। সম্মেলনে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়, বাংলাদেশে প্রতি পদে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। এ দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জীবন বিপন্ন। উপরন্তু, সরকারি প্রতিনিধিদলকে সম্মেলনে ঢুকতে এবং যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের হাইকমিশনার

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ইস্যুতে বক্তব্য দেয়া বিদেশী কূটনীতিকদের কালচারে পরিণত হয়েছে। দোষ একতরফাভাবে বিদেশীদের নয়। আমাদের। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর বালসুলভ রাজনীতির

বিদেশী রাষ্ট্রদূত এবং মিশনগুলো যেনো বাংলাদেশে 'পঞ্চায়েত' খুলে বসে আছে। অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো নিয়ে তারা সেই পঞ্চায়েতে সালিস মানতে যায়। বিদেশী কূটনীতিকের বক্তব্যকে বেদবাক্য মেনে শুরু করে নতুন রাজনৈতিক খেলা

মোফাজ্জল করিমকে বক্তব্য প্রদনে বাধা দেয়া হয়েছে। প্রশ্ন হলো, এসব করা হয়েছে কার স্বার্থে? দেশের স্বার্থে? বাংলাদেশকে একটি মানবাধিকার বর্জিত দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর কাছে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে দেশের স্বার্থ উদ্ধার হয়- পাগলেও তা বিশ্বাস করবে না। এর পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কাজ করেছে, এ কথা পরিষ্কার। হয়তো সেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফলও হবে। বাংলাদেশের তাতে বিন্দুমাত্র লাভ হবে না, এ কথা হলফ করে বলা যায়। এভাবে দেশে-বিদেশে প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক স্বার্থের বলি করা হচ্ছে স্বয়ং বাংলাদেশকে, এর ১৪ কোটি জনগণকে।

ইদানীং একটা প্রবণতা আরম্ভ হয়েছে। বিভিন্ন 'ঐক্য পরিষদ' কিংবা সংগঠনের ব্যানারে পশ্চিমা দেশে বাংলাদেশ বিষয়ক সম্মেলনের আয়োজন করা। উদ্দেশ্য, সংখ্যালঘু নির্যাতন কিংবা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারে বিদেশী রাষ্ট্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। টাকা খরচ করে মার্কিন সিনেটে এজন্য লবিষ্ট নিয়োগের উদাহরণও আছে। এভাবে নিজ দেশের অবস্থান দূর্বল করে, ভাবমূর্তি জলাঞ্জলি দিয়ে সত্যিকার অর্থে দেশে মানবাধিকারের কোনো উন্নতি ঘটে না। বরং সার্বিকভাবে বাংলাদেশের রাজনীতিবিদসহ মানুষ সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা জাগে, ইমেজের বারোটা বাজে। এ ধরনের সংগঠন কিংবা ব্যক্তিবিশেষ দেশে জনমত সৃষ্টির মাধ্যমে সরকার ও বিরোধী দলের ওপর চাপ সৃষ্টি করে না কেন সেটা একটা বড় প্রশ্ন। কথায় কথায় কেন দিল্লি-কলকাতা কিংবা লন্ডন-ওয়াশিংটনে সাংবাদিক সম্মেলন ও সেমিনার করা হয় সেটাও রহস্যময়।

'খাল কেটে বিদেশী কুমির আনা'র কর্মসূচি যে আখেরে নিজেদের জন্যই বিপজ্জনক, রাজনৈতিক দলগুলোর তা বোধগম্য নয়। দূতাবাসনির্ভর ও বিদেশমুখী রাজনীতিকরা অস্থিমজ্জার মানুষ থেকে ক্রমশ কাঠের পুতুলে পরিণত হচ্ছেন। বিদেশী প্রভুদের সুতার টানে তারা হাত-পা নাড়ছেন দেশের স্বার্থ বিক্রি করে। মীর জাফরও নবাবী চেয়েছিল। এবং ইংরেজরা তার আশা পূরণও করেছিল। সেই নবাবী কি মীর জাফরকে সুখী করেছিল?

বিদেশী কূটনীতিক এবং স্বদেশী রাজনীতিকরা কাঠগড়ায় তুলেছেন বাংলাদেশকে। এতোকালের অসাম্প্রদায়িক, ধর্মসহিষ্ণু গণতান্ত্রিক মুসলিম দেশের ইমেজ ক্ষয়িষ্ণু। এ কারণেই নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকা শিরোনাম করতে পারে 'স্টেট অব ডিসগ্রেস'। সম্প্রতি লন্ডনের দ্য ইকোনমিস্ট ম্যাগাজিন প্রতিবেদন ছেপেছে 'স্টেট অব ডিনায়াল' শিরোনামে। সঙ্গে এঁকে দিয়েছে ব্যঙ্গচিত্র- দেশের প্রধান দুই নেত্রী চুলোচুলি

সুযোগসন্ধানী পশ্চিমা দেশগুলো চায় দরিদ্র দেশগুলোকে বগলদাবা করতে। নেতিবাচক ইমেজের কারণে খুব সহজেই তারা সে কাজটি করতে পারছে। আর এই নেতিবাচক ইমেজ তৈরিতে ভূমিকা রাখছে ক্ষমতাপাগল রাজনৈতিক দলগুলো

করছেন। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো দেশের মানসম্মান কোথায় নামিয়েছে একবার ভাবুন। এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে দেশকে তালেবানি রাষ্ট্রে পরিণত করার স্বপ্নে বিভোর একশ্রেণীর অর্ধশিক্ষিত ধর্মরাজনীতিক। জিহাদি জজবায় উজ্জীবিত এসব বাস্তবতাবিমুখ 'জিহাদিরা' একদিকে ধর্মের বারোটা বাজাচ্ছে, অন্যদিকে বিদেশীদের প্রলুব্ধ করছে নানা ছুতোনাতায় আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে। এদের 'জিহাদি জোশের' কারণে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ পরিচিত হচ্ছে মৌলবাদী রাষ্ট্র হিসেবে।

যথানিয়মে অভিযুক্ত হচ্ছে বাংলাদেশ। বাইরে ইমেজ সংকটে ভুগছি আমরা। দূতাবাসে ভিসা প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে, ফিরে আসতে হচ্ছে আমাদের শ্রমিকদের। প্রবাসীদের পড়তে হচ্ছে জেরার মুখে। আমাদের রপ্তানি ও রেমিট্যান্স আয় যে কোনো মুহূর্তে সংকটের মুখে পড়তে পারে। সুযোগসন্ধানী পশ্চিমা দেশগুলো চায় দরিদ্র দেশগুলোকে বগলদাবা করতে। নেতিবাচক ইমেজের কারণে খুব সহজেই তারা সে কাজটি করতে পারছে। আর এই নেতিবাচক ইমেজ তৈরিতে ভূমিকা রাখছে ক্ষমতাপাগল রাজনৈতিক দলগুলো। রাজনৈতিক দলগুলোতে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিবিদের ঘাটতি পড়েছে, ব্যাপারটি তেমন নয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে অশুভর হাটে শুভরা কক্ষে পাচ্ছে না।

সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে আমরা ইংল্যান্ড-আমেরিকার রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রবর্তন করতে চাইলেও এ দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি তেমন পরিপক্বতা অর্জন করেনি এখনো। এ দেশে বিরোধী দল মনে করে বিরোধিতা করাই তার একমাত্র কাজ, যেহেতু তার নাম 'বিরোধী দল'। আসলে বিরোধী দল যে সরকারেরই সহযোগী, রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকারি দলের সম্পূরক, সে কথা ভাবতেই পারে না বাংলাদেশের বিরোধী দলগুলো। আবার এই বিরোধিতার মাঝেও ঘাপলা আছে। কার্যকর বিরোধিতা তো কখনো হয়-ই না, সহিংস এবং সশস্ত্র বিরোধিতা দেশের সম্পদের ক্ষতি করে, আখেরে লাভ কিছুই হয় না।

ঝড় উঠলে বালুতে মুখ লুকানোর অভ্যাস শুধু উটপাখির নয়, বাংলাদেশ সরকারেরও আছে। যে দলই ক্ষমতায় থাকুক, এ সরকারি অভ্যাসের বদল হয় না। যেকোনো অভিযোগের পর দেখা যায় সরকারিভাবে সেই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করতে। পেছনের সত্যাসত্য খতিয়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করে না সরকার। গৎবাঁধা রেকর্ডই বাজানো হয়- সমস্তই বিরোধী দলের ষড়যন্ত্র। অধিকাংশ সময় অভিযোগের সত্যতা অস্বীকার করা হয় কিংবা এড়িয়ে যাওয়া হয়। ফলে পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে হয়। দেশী-বিদেশী সরকারবিরোধী চক্র মওকা পেয়ে যায়। বাংলাদেশে জঙ্গি উপস্থিতি নিয়ে এ কান্ড হয়েছে। সরকারের তরফ থেকে দেশী-বিদেশী অভিযোগ ক্রমাগত অস্বীকার করে বলা হয়েছে এ দেশে জঙ্গির অস্তিত্ব নেই। পরক্ষণেই নিষিদ্ধ করা হলো দুটি সংগঠন জঙ্গি তৎপরতার কারণে। গ্রেপ্তার করা হলো ড. গালিবকে। এই লুকোছাপা কি দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করলো? মোটেই না। সত্য স্বীকারের মানসিকতা সব সরকারের থাকা উচিত। নয়তো মিথ্যা অভিযোগ ভিত্তি পেয়ে যায়। এ দেশের রাজনীতিবিদরা বিদেশীদের সঙ্গে আঁতাত করে দেশ বিক্রি করে দিচ্ছেন- আমরা এমন বক্তব্য কখনোই দিতে চাই না। কিন্তু দলীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে না উঠতে পারার কারণে তারা বিদেশীদের অভ্যন্তরীণ ইস্যুতে হস্তক্ষেপের সুযোগ করে দিচ্ছেন। যার পরিণতি মোটেও ইতিবাচক দিকে যাচ্ছে না।

রামায়ণের বিভীষণ মোটেই খারাপ ছিলো না। বরং রাবণকে পরামর্শ দিয়েছিল সীতাকে হরণ না করার। রাবণ শোনেনি। অপমানিত হতে হয় বিভীষণকে। ক্রোধ তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় রামের কাছে। রাবণকে শায়েস্তা করার জন্য রামের দ্বারস্থ হওয়াতেই লংকাকান্ড বেঁধে গিয়েছিল। সেটা অবশ্য পৌরাণিক যুগের কাহিনী। আমাদের রাজনীতিকরা বিশ্বায়ন যুগের মানুষ। তাদের কাছে জানতে চাই, দেশের অস্তিত্ববিনাশী এই আত্মঘাতী কর্মযজ্ঞ বন্ধ হবে কবে?